সেলিম রেজা নিউটন

কথা বলতে হবে বাংলাদেশকে, নামতে হবে রাস্তায়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ছবি: বিবিসি

তারিখটা লিখে রাখি। ১৫ই জুলাই ২০২৪। বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমনে 'মুক্তিযোদ্ধা' হেলমেট লীগের নির্বিচার, পাইকারি হামলা।

তার আগে ১৪ই জুলাই চীন সফর পরবর্তী সংবাদ-সম্মেলনে শেখ হাসিনা প্রকারান্তরে "রাজাকার" বলে অভিহিত করেছিলেন সমস্ত আন্দোলনকারীকে। বলেছিলেন, আন্দোলনকারীরা আইন মানে না, আদালত মানে না, সংবিধান পড়েও দেখে নি। তারা বিচারবিভাগ, নির্বাহী বিভাগ, জাতীয় সংসদের কার্য পরিচালনা বিধি কিচ্ছু জানে না।

সারা দেশের মানুষের সহানুভূতি পাওয়া এই আন্দোলন নিয়ে সরকারের মনোভাব শুরু থেকেই ছিল নেতিবাচক। ৭ই জুলাই হাসিনা বলেন, "আন্দোলনের নামে পড়াশোনার সময় নষ্ট করা, এটার কোনো যৌক্তিকতা

আছে বলে আমি মনে করি না"। একই সাথে তিনি বলেন, "আদালতে নিষ্পত্তি করা উচিত"। একই দিনে শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী "ষড়যন্ত্র আছে কি না" সে কথা তোলেন। তাঁর পাশাপাশি সরকারি দলের সাধারণ সম্পাদক ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের "আন্দোলন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ" করার কথা বলেন। এর পর সপ্তাহ জুড়ে এক দিকে হাইকোর্টে নিষ্পত্তির কথা, অন্য দিকে আন্দোলন দমনের হুমকিসূচক কথা বলতে থাকেন বিভিন্ন মন্ত্রী। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, আন্দোলনকারীরা "লিমিট ক্রস করে যাচ্ছে"। সবারই এক কথা– চাকরির কোটার ব্যাপারটা হাইকোর্টে আছে। সুতরাং তাঁদের কিছু করার নাই।

তাহলে এই ১৫ই জুলাইয়ে এসে সরকারি পদ-ক্ষমতা-পারিতোষিক প্রাপ্ত 'মুক্তিযোদ্ধা' হেলমেট লীগের লাঠিয়াল-বন্দুকবাজরা যখন নির্বিচার পিটাতে নেমেছে ছেলেমেয়েদেরকে, তারা কি আইন-আদালত মেনে, সংবিধান পাঠ করেই এসেছে? হামলা কি তাহলে হাইকোর্ট দেখানোরই অংশ?

সরকারের আদালত-ভক্তি ২০১৭ সালে খোদ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সিনহা সাহেবকে চাকুরি-ছাড়া এবং দেশ-ছাড়া করার কথা মনে না করিয়ে পারে না। সে সময় আমরা দেখেছিলাম কীভাবে নির্বাহী বিভাগ বিচারপতি সিনহার বাসায় সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা (ডিজিএফআই) পাঠিয়ে তাঁকে ১৫ দিন ধরে যোগাযোগহীন অবস্থায় গৃহবন্দি করে রেখে, তাঁর কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে বদলি করে দিয়ে, তাঁকে 'ছুটি' নিতে বাধ্য করে বিমানে তুলে নির্বাসনে পাঠাতে পারে। তার মানে, এমনকি সর্বোচ্চ আদালতের সর্বোচ্চ বিচারপতিকে 'ডিল' করার ক্ষেত্রেও হাসিনার নির্বাহী বিভাগ কী করতে পারেন তার দৃষ্টান্ত আছে।

সংবাদ-সম্মেলনে আন্দোলনকারীদের পরোক্ষভাবে 'রাজাকার' বলে অভিহিত করায় রাতেই তাঁরা মিছিলে নামেন। ১৫ই জুলাই মধ্যরাতে ছেলেরা এবং মেয়েরা হল থেকে বেরিয়ে আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ক্ষোভ ও আবেগ থেকে অভূতপূর্ব ও তীব্র বিপরীতাত্মক স্লোগান ওঠেঃ "তুমি কে, আমি কে? রাজাকার, রাজাকার।"

পরের দিনই আমরা দেখতে শুরু করি শেখ হাসিনার বেসরকারি বলপ্রয়োগ-বিভাগ ওরফে ছাত্রলীগ হাইকোর্টে থাকা মামলার ব্যাপারে প্রতিপক্ষদের কী করতে পারে। সারাদিন ধরে সেটা চলার পর ১৬ই জুলাই মধ্যরাতেও ফেসবুকের লাইভে এবং অনলাইন পোর্টালে দেখছি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের

বহিরাগত 'মুক্তিযোদ্ধা'দের আতঙ্কে মেয়েরা ভিসির বাসার সীমানাপ্রাচীরের ভেতরে আশ্রয়ে নিয়েছে।

এই ছাত্রলীগ মুক্তিযুদ্ধের ছাত্রলীগ না। এরা আইয়ুব খানের এনএসএফের প্রেতাত্মা। এরা নব্য কাউয়াদের হাতুড়ি-হেলমেট কোটার 'মুক্তিযোদ্ধা' লীগ। প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ এবং পুলিশের আশ্রয়ে থেকে এরা আমাদের মারছে ছেলেমেয়েদেরকে। এদের হাতে মার খাওয়ার জন্যই কি বাংলাদেশ তার ছেলেমেয়েদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পাঠিয়েছে? হাসিনা এবং তার মন্ত্রীদের কয়জনের ছেলেমেয়ে বাংলাদেশে থাকে? চাকুরির দাবিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করা অপরাধ?

দুই।

ছাত্রলীগ যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনরত ছেলেমেয়েদেরকে পেটাতে শুরু করে দিয়েছে, আমি তখন রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন "বিটিভি"সহ একাধিক টিভি-চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার করা সোয়া এক ঘণ্টার সংবাদ-সম্মেলনের সম্পূর্ণটা দেখলাম বসে বসে। ষোল বছর ধরে কত কিছুই তো দেখছি, তবু আরো একবার অবিশ্বাস চোখে নিয়ে দেখলাম একজন একনায়কের প্রজ্ঞাহীন উচ্ছলতার সামনে আমাদের দেশের প্রথিতযশা সাংবাদিকদের হাততালি ও হাত-কচলানোর লাইভ প্রদর্শনী। মনে পড়ছিল, জেনারেল এরশাদকে শিল্পী কামরুল হাসান এঁকেছিলেন "বিশ্ববেহায়া" হিসেবে। সেই এরশাদকে এঁর তুলনায় হাঁটুর সমান স্বৈরশাসক বলে মনে হয়।

একনায়কেরা এক প্রকার আত্মসম্মানবোধহীনই হন সেটা আবারও বুঝলাম। আত্মমর্যাদাবোধ থাকলে সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য সংবাদ-সম্মেলনে কেউ "তুই-তাকারি" করতে পারেন? এই প্রফেসররা যদিও অনেক আগেই তাঁর চরণকমলে দাসখত লিখে আত্মমর্যাদা খুইয়ে করে বসে আছেন– তাতেও কি একনায়কের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়? একটা মানুষের ব্যক্তিগত রুচিবোধেরও তো একটা ব্যাপার আছে। এমনকি দলদাসদের ব্যাপারেও আপনি কী ভাষায় কথা বলেন সেটা কি সত্যিই কোনো ব্যাপার না?

একাত্তর ছিল জনযুদ্ধ। একাত্তরের বাংলাদেশে প্রত্যেকেই মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। আজ্ঞে, প্রত্যেকে। গোটা দেশের সাত কোটি লোকই মুক্তিযুদ্ধ

করেছিলেন। বাংলাদেশটা এমনি এমনি স্বাধীন হয় নি।

রাজাকার ছিল কয় জন? বলতে গেলে হাতেগোনা কিছু কুলাঙ্গার। কেউ কেউ এমনকি প্রাণভয়েও রাজাকারের খাতায় নাম লিখিয়েছে। আর উনি বলতে চাইছেন উনার পার্টির লোকেরা ছাড়া সবাই রাজাকার। মুক্তিযোদ্ধা বলতেও কি অল দ্য প্রাইম মিনিস্টার্স মেন (অ্যান্ড উইমেন)? বন্দুকই শুধু যদি মুক্তিযুদ্ধ হয়, উনি নিজে কোন ফ্রন্টে যুদ্ধ করেছিলেন? আত্মঘাতী যুক্তিবোধেরও তো একটা সীমা আছে।

মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করা শুরু হয়েছিল কবে? সিরাজ সিকদার মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না? জাসদের ছেলেমেয়েরা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না? চারটা সরকারি কাগজ ছাড়া সবগুলো পত্রিকাকে, এবং একমাত্র বাকশাল ছাড়া সবগুলো রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করেছিল কারা? রীতিমতো সংবিধান সংশোধন করে একদলীয় শাসন চালু করেছিল কারা? আর, একাত্তরে যুদ্ধ করেছিল কারা? আওয়ামী লীগের সব কয়টা এমপি গিয়ে বসে ছিলেন কলকাতায়।

বাহাত্তর সালে কয় জন সম্মুখযোদ্ধা যুদ্ধ-পরবর্তী আওয়ামী লীগের বিক্রি করা মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট কিনতে গিয়েছিলেন? কয় জন অতখানি আত্মসম্মানবোধহীন ছিলেন? টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেট বিক্রি হয়েছিল পার্টি অফিসে। আর, মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা ছিল গণপ্রতারণা। ঐতিহাসিক রসিকতারও সীমা আছে। সরকারি সার্টিফিকেট আর চাকরির কোটা পাওয়ার জন্য জীবনবাজি ধরেছিলেন একাত্তরের সম্মুখযোদ্ধারা?

এইসব কথা বলে একাত্তর যারা চেনে না তারা। তারাই এদেশে সম্মুখযোদ্ধাদের অসম্মান ও উপেক্ষা করতে শুরু করেছিল ১৯৭১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর থেকে। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিব বলেছিলেন, আওয়ামী লীগ চোরের দল। এই চোরেরাই আজকে হাসিনার নেতৃত্বে দেশ চালায়। এই চোরেরাই চায় কোটা-মার্কা চাকরি। মুক্তিযুদ্ধের নামে এরা চাকরি চুরি করে, গণতন্ত্র চুরি করে, লাখ লাখ কোটি টাকা চুরি করে, আন্দোলন আর সভা-সমাবেশের অধিকার চুরি করে, বিদ্যুত চুরি করে। আর চুরি করে শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন এবং ভবিষ্যত।

হ্যাঁ, প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ-সম্মেলনের পুরোটাই আমি দেখেছি বৈকি। দেখলাম স্তাবক সাংবাদিকদের হাততালি দেওয়ার সম্মেলন। দেখলাম উনি স্তুতি

ভালোবাসেন। বিদূষক ও ভাঁড় দেখলে খুশি হন, হাসেন। দেখলাম উনি বুক ফুলিয়ে বলছেন, আমি কারো কথায় কান দেই না। দেখলাম উনি সারা দেশের সবগুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে "প্রত্যয়"-পেনশন স্কিম নিয়ে আন্দোলনরত প্রফেসরদের ব্যাপারে তুই-তাকারি করে কথা বলছেন। "তোরা আন্দোলন করবি, কর। দেখি তোরা কত আন্দোলন করতে পারিস"। দেখলাম উনি সংবাদ-সম্মেলনে উপস্থিত সাংবাদিক-নেতৃবৃন্দকেও নিম্নস্তরের রাজকর্মচারীর বেশি সম্মান করতে আগ্রহী নন।

স্বাভাবিক, খুবই স্বাভাবিক। স্বেচ্ছাদাসের হাতকচলানোকে যাঁরা নিজেদের সম্মানের উচ্চতম মাপকাঠি বলে মনে করেন, একনায়ক হওয়া তাঁদেরকেই মানায়।

তিন।

গুরুতর ব্যাপার হলো, আজকের এই রেজিম প্রতিষ্ঠার পুরো প্রেক্ষাপটটা মূলত ১৯৯০-পরবর্তী সময় থেকে শুরু করে তিলে তিলে গড়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের যে-ন্যারেটিভ দিয়ে খোদ সেটা এই প্রথম এই সরকারের বিরুদ্ধে বুমেরাং হয়ে উঠতে শুরু করছে বলে মনে হচ্ছে। সম্ভবত মূল সেই ন্যারেটিভটাকেই প্রকারান্তরে প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়-পড়ুয়া বর্তমান প্রজন্ম।

প্রধানমন্ত্রীর প্রতিও প্রকাশিত হয়েছে তীব্র অনাস্থা। গণতন্ত্রহীনতা, অত্যাচার, জুলুম ও দুর্নীতির চলতি রেজিমকে জায়েজ করার জন্য 'মুক্তিযুদ্ধ' শব্দটার এমন পাইকারি অপপ্রয়োগ করেছে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার এবং তার মিডিয়া ও থিংকট্যাঙ্ক যে, শব্দটা ইতোমধ্যে একটা প্রোপাগাণ্ডা-শব্দে পরিণত হতে শুরু করেছে।

মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকারের জনযুদ্ধ-ন্যারেটিভটাকে পুনরুদ্ধার করা এখন আমাদের একটা বড়ো কর্তব্য হয়ে উঠছে। বর্তমান রেজিমের অজস্র অন্যায়ের বিরোধিতা করতে পারার সক্ষমতাই হবে সেই কর্তব্য পূরণের প্রধান শর্ত। বাংলাদেশকে তাই কথা বলতে হবে। নামতে হবে রাস্তায়। #

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ১৫ ও ১৬ই জুলাই ২০২৪